মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, নবম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্বপ্ন দেখতে হবে আকাশচুম্বী

শেষ হলো ‘সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ’ দ্বিতীয় পর্যায় : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

‘স্বপ্নের পরিধি হচ্ছে আকাশচুম্বী, স্বপ্নের কোনো পরিসীমা হয় না। তোমাদের আকাশচুম্বী স্বপ্ন দেখতে জানতে হবে’ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপনী উৎসবে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্যে গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক রওনক জাহান একথা বলেন। রওনক জাহান আরও বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে নারী শিক্ষার অনেক অগ্রগতি হয়েছে যা বহুবছরের নারী আন্দোলনের ফলে অর্জিত হয়েছে। যে স্বপ্নের কথা বেগম রোকেয়া সুলতানার স্বপ্নে লিখেছেন তা সারা পৃথিবীর মেয়েদেরই স্বপ্ন। বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি সুজান ভাইস বলেন, সুলতানার স্বপ্ন বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অংশ এটি একটি সৃজনশীল রচনা যা লিঙ্গীয় সমতা, বিজ্ঞান, কিংবা সৃষ্টিশীল কল্পকাহিনীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা বহন করে। সমতার বিশ্ব গড়তে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ কীভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় তার জন্য আজকের এই আয়োজন। সুলতানার স্বপ্ন পঠন সামগ্রী হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা উল্লেখ্য করে তিনি বলেন- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, গ্রন্থাগার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় শিক্ষার্থীদের মাঝে সুলতানার স্বপ্ন ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। নারী কিংবা পুরুষ উভয়ের জন্যই বাধা আছে উল্লেখ্য করে সুজান ভাইস বলেন রোকেয়া আমাদের দেখিয়ে গেছেন কীভাবে বাধা অতিক্রম করে স্বপ্ন দেখতে হয়।

অনুষ্ঠানে অনান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির আহ্বায়ক মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক রিফাত জাহান, অভিযাত্রী দলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন পর্বত আরোহী নিশাত মজুমদার, উৎসব আয়োজন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দিনব্যাপী চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

Directing Stories: Memory, Place & Identity

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্র এবং গুপী বাঘা প্রোডাকশনস লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা Directing Stories: Memory, Place & Identity।

এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রামাণ্যচিত্র ও সমকালীন শিল্পচর্চার মাধ্যমে স্মৃতি, স্থান ও পরিচয়ের

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নাঈম মোহাইমেনের ‘এ মিসিং ক্যান অব ফিল্ম’ : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের আয়োজনে নাঈম মোহাইমেন-এর অনুসন্ধানামূলক চলচ্চিত্র “এ মিসিং ক্যান অব ফিল্ম”-এর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় গত ৯ জানুয়ারি ২০২৬। জাদুঘরের মিলনায়তনে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গবেষক, শিক্ষার্থী, চলচ্চিত্রকর্মী ও আগ্রহী দর্শকদের জন্য প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত ছিল।

প্রদর্শনী শুরুর আগে নির্মাতা নাঈম মোহাইমেন চলচ্চিত্রটি ও জহির রায়হানকে নিয়ে সংক্ষেপে কথা বলেন। তিনি বলেন,

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজন
নতুন প্রজন্মের কণ্ঠে জোয়ান বায়েজের ‘বাংলাদেশ, বাংলাদেশ’

১৯৭১ সালে, যখন সীমাহীন দুঃখযন্ত্রণার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমঞ্চে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, তখন বিশ্বখ্যাত শিল্পী জোয়ান বায়েজ গেয়েছিলেন ‘বাংলাদেশ, বাংলাদেশ’– শিরোনামে একটি গান, যা ছিল বিশ্বের বিবেকের প্রতি এক মানবিক আহ্বান। তাঁর কণ্ঠে তিনি তুলে ধরেছিলেন স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য সংগ্রামরত একটি জনগোষ্ঠীর কষ্ট– রাজনৈতিক ভাষণে নয়, বরং গভীর সহমর্মিতায়। সেই গান মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সম্মিলিত দায়িত্বের কথা। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পর, সেই গান আজও শুধুই স্মৃতি নয়, এক জীবন্ত সাক্ষ্য।

জোয়ান বায়েজ বাংলাদেশের শিশুদের তাঁর ঐতিহাসিক গান ‘বাংলাদেশ, বাংলাদেশ’ পরিবেশনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে এক বিশেষ ও ব্যতিক্রমী অনুমতি প্রদান করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আমন্ত্রণে এই কালজয়ী গানকে দৃশ্যমাধ্যমের জন্য শিশু কোরাস দল দিয়ে এনিগমা টিভির সহযোগিতায় নতুনভাবে বাংলায় তৈরি করছেন দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীতশিল্পী ও পরিচালক বাপ্পা মজুমদার এবং নির্মাতা পিপলু আর. খান।

গত ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে ধারণ করা হলো গানটির দৃশ্যায়ন। সঙ্গীতে প্রশিক্ষিত শিশুরা ছাড়াও এই আয়োজনে অংশ নিয়েছে এসওএস শিশুপল্লীর অনাথ শিশুরা, নালন্দা হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগ ‘বধ্যভূমির সন্তানদল’-এর সাথে যুক্ত শিশুরা।

এই ভিন্ন ভিন্ন পরিসর থেকে আসা শিশুরা একটি গানে একত্রিত হয়ে সহমর্মিতা ও আশার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এটি কেবল একটি সঙ্গীতায়োজন নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উচ্চারণ, যা বাংলাদেশের পরিচয়কে পুনরায় নিশ্চিত করে, জাতি হিসেবে যার ভিত্তি মানবিক মর্যাদা ও সংহতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

একইসঙ্গে এটি আজকের নবীন প্রজন্মের পক্ষ থেকে বিশ্বের প্রতি এক বার্তা– আমরা স্মরণ করি।/আমরা অনুভব করি।/আমরা সাড়া দিই।

যেভাবে একদিন এই গান বিশ্বব্যাপী সহমর্মিতা জাগ্রত করেছিল, আজও এই পরিবেশনার লক্ষ্য সেই সংবেদনশীলতাকে পুনরুজ্জীবিত করা– যখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানাভাবে মানুষ এই মুহূর্তে আঘাত, বঞ্চনা আর ঘৃণার শিকার। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় মমতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং মানবচেতনার অদম্য শক্তির চিরন্তন গুরুত্ব।

মুক্তিযুদ্ধের উপসেনাপতি ও বিমান বাহিনীর প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা
এ কে খন্দকার বীর উত্তম স্মরণানুষ্ঠান

মুক্তিযুদ্ধের উপসেনাপতি ও বিমান বাহিনীর প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে খন্দকার স্মরণে তাঁর সহযোদ্ধা ও সমসাময়িকদের নিয়ে গত ৫ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে স্মরণানুষ্ঠান। মহুয়া মঞ্জুরী সুনন্দার পরিবেশনায় ‘আছে দুঃখ/আছে মৃত্যু/বিরহ দহন লাগে...” সংগীত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে স্মরণানুষ্ঠানের সূচনা হয়, এরপর মুক্তিযুদ্ধে এ কে খন্দকারের অবদান ও বিমান বাহিনী নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই পরম সুহৃদকে স্মরণ করে ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি মুক্তিযোদ্ধা, প্রবাসী সরকার, ভারতীয় সরকার ও ভারতীয় সেনাবাহিনী এই চারটি পক্ষের মধ্যে সমন্বয়কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সবাইকে নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল লক্ষনীয়। এটি তাঁকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। নিজস্ব বিমানবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের উপসেনাপতির দৃঢ় অবস্থানের ফলেই সম্ভব হয়েছিল কিলো ফ্লাইট নামে বাংলাদেশের বিমান বাহিনী গঠন করা কিন্তু তাঁর এই অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন হয় নি বলে মন্তব্য করেন কিলো ফ্লাইটের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার বীরপ্রতীক। তিনি তাঁর অতুলনীয় রণকৌশল ও বিচক্ষণতার কথাও উল্লেখ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের কর্মকর্তা ও সাবেক সচিব ওয়ালিউল ইসলাম-এর স্মৃতিচারণায় উঠে আসে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধকালে এ. কে খন্দকার রণাঙ্গণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যথা যথ উপাত্ত দিয়ে তাজউদ্দিন আহমদকে বোঝাতে পারতেন সেই তথ্য। তিনি বলেন, এ কে খন্দকার মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করে প্রায়শই স্মৃতিকাতর হতেন এমন কী কান্না করতেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান এ কে খন্দকারের সাথে প্রথম সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রথম দর্শনে তাঁকে আমার মনে হয়েছিল একজন অধ্যাপক, কোন সামরিক বাহিনীর সদস্য বা যুদ্ধ বিমানের পাইলট বলে মনে হয়নি। তিনি ছিলেন অমায়িক, বিনয়ী, স্বল্পভাষী, সজ্জন এবং সৎ একজন মানুষ। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান ছিল অনেক বেশি, প্রথাগত সামরিক কৌশলের চাইতে তিনি সমসাময়িক বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন, যে কারণে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে একটি সত্যিকারের গেরিলা যুদ্ধভিত্তিক জাতীয় সংগ্রামে রূপ দিতে চেয়েছিলেন এবং তিনিই প্রথম যুক্তি দিয়ে ভারতীয় মিত্রদের এবং জেনারেল মানেক শ’কেও বোঝাতে সক্ষম হন যে পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে মুক্তিযুদ্ধ কেবল গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেই কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন : শিল্পীদের সাথে আলাপচারিতা

শিল্পকথন

‘সুলতানার স্বপ্ন’ রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন রচনা করেছেন একশ’ বিশ বছর আগে, শতবছর পরে কলাকেন্দ্র ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে বর্তমানের উনিশ জন শিল্পী রোকেয়ার ভাবনার সাথে নিজেদের ভাবনাকে মিলিয়ে সৃষ্টি করেছেন শিল্পকর্ম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সেই শিল্পকর্মের তিন মাসব্যাপী প্রদর্শনি শুরু হয়েছে। শিল্পীদের নিজস্ব অভিজ্ঞা ও ভাবনাকে সকলের সাথে ভাগ করে নিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিল্পকথন শিরোনামে এক আয়োজন করে গত ১৬ জানুয়ারি। প্যানেল ডিসকাশনের আদলের এই আয়োজনের শুরুতে প্রদর্শনির কিউরেটর শার্মিলি রহমান সামগ্রিকভাবে প্রদর্শনির বিশিষ্টতা তুলে ধরে বলেন, প্রতিটি শিল্পীকে বলা হয়েছিল তাদের নিজেদের স্বপ্নটাকে এসময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলতে, ফলে প্রদর্শনিতে ভিন্নতা এবং বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। যে কারণে প্রদর্শনীতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পৃথক থাকেনি, একটি ধারাবাহিকতায় চলে এসেছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কিছু অভিজ্ঞতার জায়গায় দাঁড়িয়ে একইভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে, ফলে এসময়ে দাঁড়িয়ে একজন শিল্পী যখন সুলতানার স্বপ্নকে দেখেন, তখন সে মনে করে না যে এটি তার সাথে যুক্ত নয়। কিউরেটর মনে করেন শিল্পীরা সুলতানার স্বপ্নকে একটি লেন্সের মধ্য দিয়ে না দেখে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহুধারার গল্পের মধ্যে যা প্রদর্শনিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। আর শিল্পকর্মগুলো দর্শকদের নিজস্ব ভাবনার জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, নির্দিষ্ট একটি ভাবনায় দর্শকরা আবদ্ধ থাকবেন না বলে তিনি উল্লেখ করেন। যদিও দর্শকের ভাবনার জন্য শিল্পকর্ম উন্মুক্ত থাকে তবে প্রত্যেক শিল্পীর আত্মোপলব্ধির একটি জায়গা থাকে, সেই অবস্থান থেকে ইফফাত রেজোয়ানা রিয়া মনে করেছেন সুলতানার স্বপ্নটা বর্তমানের নারীদেরও স্বপ্ন, কাজেই তিনি তার কাজের মধ্যে একটা জার্নি তৈরি করেছেন যে জার্নিটা রোকেয়া শুরু করেছিলেন এবং এখনও সেটা শেষ হয়নি, বর্তমানের নারীরাও সেই জার্নির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। শিল্পী ফারেহা যেবা সুলতানার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের কৈশোরে, যখন তিনি প্রথম সুলতানার স্বপ্ন পড়েন তখন নারীমুক্তির দিকটি তার দৃষ্টিগোচর হয়নি, তিনি দেখেছিলেন সায়েন্স ফিকশন, একধরনের ফ্যান্টাসি। এত বছর পরেও তিনি তার শিল্পকর্মের মধ্যে সেই ফান্টাসিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। তার ভাবনায় বিশ্বব্রহ্মান্ড একইভাবে ঘুরছে, সুলতানার স্বপ্নের অনেককিছুর বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, মানুষ রকেটে করে চাঁদে যাচ্ছে, কত উদ্ভাবন হচ্ছে, কিন্তু নারীরা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নই থেকে যাচ্ছে। ফারজানা আহমেদ উর্মির গল্পটা হয় ভিন্ন, তার পারিবারিক পরিবেশে তিনি পুরুষের অভিভাকত্ব পান নি, ব্যক্তি পরিসরে তিনি স্বাধীন। তিনি মনে করেন নারী বা পুরুষ নয়, মূল বিষয় মানুষ। মানুষ হিসেবে যে জায়গায় তিনি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছেন এবং যেখানে পারছেন না, এই দুয়ের পার্থক্যকে তিনি ঘোচাতে চান। জাফরিন গুলশানের ভাবনায় সুলতানার স্বপ্নের প্রেক্ষাপট আর বর্তমান প্রেক্ষাপটের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখন ফেমিনিজমের কথা বলা যায়। তবে যে জায়গায় পরিবর্তন হয়নি সেটি হলো জ্ঞানের চর্চা। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছেন, জাফরিন সেই জায়গা থেকেই কাজ করেছেন। আয়োজনে পুরুষ শিল্পীদের কথায় উঠে আসে তাদের পরিবারের নারী তথা তাদের মা, ঠাকুমার কথা। যাদের অভিজ্ঞতাকে তারা সুলতানার স্বপ্নের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কাজের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। শিল্পী জয়তু চাকমা তার শিল্পকর্মে পিনন কাপড়ে সূচিকর্মের মাধ্যমে রাজা ও রানীকে একত্রে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, তাস যখন কেউ খেলে তখন রাজার চাইতে রানীর ক্ষমতা বেশি হয়। তিনি দেখেছেন তার মা বা অন্য নারীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতো, পুরুষের থেকে তারা বেশি কাজ করতো, এমনকি নৃগোষ্ঠির নারীরাই তাদের ঐতিহ্য এখনো ধরে রেখেছেন। পলাশ ভট্টাচার্য্য দেখেছেন যে তার ঠাকুমা এবং তাদের সমসাময়িক নারীদের একধরনের অভিভাবকত্ব ছিল, যা এলাকার সবাই মানতো, এই অভিভাবকত্ব তাকে এখনো ভাবায় এবং তিনি কোথাও একটা গরমিল খুঁজে পান আজকের সাথে। শিল্পী বিলাস মন্ডল তার মায়ের স্বপ্নের সাথে সুলতানার স্বপ্নের যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক শিল্পীই তাদের এই ভাবনাগুলোকে কাজের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। আয়োজনের আমন্ত্রিত অতিথি ড. তাজিন মুরশিদ বলেন শিল্পীরা ভিন্ন ধারায়, ভিন্ন মাত্রায় সুলতানার স্বপ্নকে সমসাময়ীকিকরণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন আয়োজনটা বাংলাদেশে ইউনিক। তিনি মনে করেন এক অর্থে দলীয় কাজ আবার ঠিক সম্মিলিত শিল্প না, কাজের মধ্য দিয়ে কালেক্টিভ ওয়ার্ক হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পী একটা ব্যক্তিগত জার্নি করেছেন, সবটা মিলিয়ে প্রদর্শনীতে বড়ো মাপের বৈচিত্র তৈরি হয়েছে।

‘এ মিসিং ক্যান অব ফিল্ম’ : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

‘চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিল, ব্যক্তি জহির রায়হান থেকে জহির রায়হানের লিজেন্ডই বেশি খুঁজে পেয়েছি।’

তিনি আরও মনে করেন, জহির রায়হানকে জানতে হলে তাঁর কাজের ভেতরেই ফিরে যেতে হবে। ফলে নতুন ছবিটি নির্মিত হয়েছে মূলত জহির রায়হানের বিভিন্ন চলচ্চিত্রের দৃশ্য, শট ও কাটের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে। ‘এ মিসিং ক্যান অব ফিল্ম’ চলচ্চিত্রটি প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও সাহিত্যিক জহির রায়হান-এর চলচ্চিত্রিক উত্তরাধিকার ও ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করে। চলচ্চিত্রটি জহির রায়হানের নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহের সূত্র ধরে এগোয়, যিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কালজয়ী প্রামাণ্যচিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’ নির্মাণের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। জহির রায়হান নির্মিত ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রসমূহ এবং সেগুলো নির্মাণের নানা দিক তুলে ধরা হয় ‘এ মিসিং ক্যান অব ফিল্ম’-এ। এর মধ্যে ‘জীবন থেকে নেয়া’ ও ‘স্টপ জেনোসাইড’ চলচ্চিত্রের বাইরেও তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত প্রদর্শিত হয়। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুর অঞ্চলে স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা তিনি শহিদ হয়েছেন বলে মনে করা হয়। তিনি দশটি চলচ্চিত্র পরিচালনা ও বারোটি উপন্যাস রচনা করেন।

প্রদর্শনীর পর জহির রায়হানের ছেলে তপু রায়হান বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, ‘বাবাকে আমি দেখিনি। আমি তাকে জেনেছি মায়ের কাছে, অন্যের কাছ থেকে গল্প শুনে। আর তার সিনেমা দেখে, তার বই পড়ে।

আমার খুব গভীরভাবে মনে হচ্ছে, বাবা যান নি, তিনি আছেন। তিনি আছেন তার গল্পে, তিনি আছেন তার ছবির ফ্রেমে, তিনি আছেন তার প্রস্তাবনার মধ্যে।’

নির্মাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তপু রায়হান বলেন, ‘আপনারা শুধু একজন মানুষকে নয়, একটি সময়কে আবার আলোতে এনেছেন।’ চলচ্চিত্রটি প্রসঙ্গে তার মনে হয়েছে, এ ধরনের ছবি বানাতে সাহস লাগে, আর সেই সাহস তিনি (নাঈম মোহাইমেন) দেখিয়েছেন।

নির্মাতা নাঈম মোহাইমেন চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র ও প্রবন্ধের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যক্তিগত স্মৃতি ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের টানাপোড়েন নিয়ে কাজ করে থাকেন। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজুয়াল আর্টস বিভাগে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের পরিচালক।

প্রদর্শনীর শেষে পরিচালক ও দর্শকদের মধ্যে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে গবেষক, শিক্ষার্থী ও চলচ্চিত্রকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

এম. ফারহাতুল হক
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, চলচ্চিত্র কেন্দ্র

সুলতানা'র স্বপ্ন অবারিত

প্রথমবারের মতো বাংলার পাঁচ নারী মিলে গিয়েছিলাম শীতকালীন হিমালয় অভিযানে ২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর। গত অভিযানের ধারাবাহিকতায় এবারও শীতকালীন হিমালয় অভিযানে গিয়েছিলাম চার সুলতানা। এবারের অভিযানের পরিকল্পনায় ছিল ৬০৯১ মিটার উচ্চতার পিসাং পর্বত এবং ৫০০০ মিটার উচ্চতার রাক্সি পর্বত। এই অভিযানে দলনেতা নিশাত মজুমদারের সাথে ছিল তাহুরা সুলতানা রেখা, ইয়াছমিন লিসা এবং নবীন অভিযাত্রী 'ট্রেক উইথ নিশাত' ২০২৫-এর বিজয়ী নুসরাত জাহান ফাবিহা। কালিদাসের মেঘদূত নয় বাংলাদেশ বিমানের মেঘদূত পৌঁছে দিয়েছে হিমালয় কন্যা নেপালে। পৌঁছাতে পৌঁছাতে দিনের আলো নিভে গিয়েছিল কাঠমান্ডু শহরে। রাতের বাসে চেপে পোখারা শহরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ভোর। এবারের গন্তব্যে যাবার অনেকটা পথেই গাড়ির রাস্তা আছে। পোখারা থেকে বেসিশাহার, বেসিশাহার থেকে চামে পৌঁছাই গাড়িতে চড়ে। গাড়ির রাস্তা বহুদূর চলে গেলেও এখান থেকেই আমাদের ট্রেকিং শুরু হয়। ট্রেকিং রুটে গাড়ি দেখতে আমাদের ভালো না লাগলেও স্থানীয়দের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয়। যত সময় যাচ্ছে পৃথিবীর দুর্গমতা ততই কমে আসছে। শেষ বিকেলে চামে পৌঁছেই হাঁটতে বের হই। আমাদের লজের উল্টোদিকেই সুন্দর একটা একতলা বাড়িতে পাথর না কেটেই ঘর বানানো। প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো থাকতে দিলে আমাদের এতো এতো পরিবেশ আন্দোলন, জলবায়ু সম্মেলন এগুলো করতে হতো না। চামে গ্রামের ভেতর দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা চার্চ দেখতে পাই। স্থানীয় একজনের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম এই গ্রামে ১% মানুষ এখন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। বাকিরা বুদ্ধিষ্ট, লামা ও গুরুং সম্প্রদায়ের। এখানে একটা আর্মি ক্যাম্পও আছে। মারসিয়াংদি নদীর পাড় ঘেঁষে চামে গ্রাম। এই অভিযানের অনেকটা পথেই এই নদী আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। সকাল সকাল শুরু হয় আমাদের পথচলা। গ্রাম ছাড়িয়ে পাইন বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। খরচ কমাতে সকাল আর দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা নিজেরাই করবো বলে ব্যাগ ভর্তি অনেক খাবার। ব্যাকপ্যাকের ওজন দাঁড়িয়েছে ২৪/২৫ কেজি। এই ভারী ব্যাকপ্যাক নিয়েই হেঁটে চলেছি। সারি সারি আপেল বাগানের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলা পথ ধরে চলছি 'চার সুলতানা'। সূর্য অস্ত গিয়ে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসার মুখে পৌঁছাই আপার পিসাং। রাতে দেখা হয় আমাদের গাইড-পোর্টারদের সাথে। অতি উচ্চতার সাথে খাপ খাওয়াতে পরদিন বেরিয়ে পড়ি। পাইন বনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হেঁটে আসি বেশ অনেকটা পথ। ফেরার পথে তিনজন বৃদ্ধ মানুষের দেখা পাই, রোদে বসে জপমালা হাতে মন্ত্র জপছিল। ভাষাগত দূরত্বের কারণে কথা বেশিদূর এগোতে না পারলেও চেষ্টা করি কথা বলার। অভিযানের জন্য আশীর্বাদ করে দেয়। পিসাং গ্রাম থেকে পরদিন বেরিয়ে পড়ি বেসক্যাম্পের উদ্দেশ্যে, রাতের আঁধার কেটে চাঁদের আলোয় পুরো হিমালয় জ্বলজ্বল করছিল। এমন একটা রাতে হিমালয়ে থাকার স্বপ্ন বহুদিনের। বেসক্যাম্প থেকে পরদিন হাইক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা। হাইক্যাম্পের বেশ খানিকটা পথ বরফে ঢাকা, অন্য সময়ে এখানে ছোটছোট সবুজ ঘাসের দেখা পাওয়া যায়। বুটজোড়া বেশ কয়েকবার ব্যবহার করায় পুরাতন হয়ে গেছে। চুইয়ে চুইয়ে জুতা-মোজা ভেদ করে পা জমে যাবার উপক্রম। হিমালয়ে অতি সামান্য কারণেও বড় দুর্ঘটনা ঘটার অনেক উদাহরণ আছে। এযাত্রায় বড় কোনো সমস্যা না হলেও এই সামান্য কারণেই পুরো শরীর শীতল হয়ে আসতে শুরু করে। নিশু আপু আর রেখা তাঁবুতে পৌঁছেই হাত-পা মালিশ করা শুরু করে। শরীর স্বাভাবিক লাগা শুরু হলেও খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। খাবারের গন্ধে অস্বস্তি হতে শুরু হয়। পিসাং পর্বত সামিট পুশের রাতে অসুস্থ শরীর নিয়েই যাবার সিদ্ধান্ত নেই। আমার জন্য পুরো টিমের দেরি হয়ে যায়। কিছুটা পথ যাবার পর মনে হলো এভাবে চলতে থাকলে পুরো টিমেরই ধীরগতিতে চলতে হবে। তাছাড়া অর্ধেক পথে গিয়ে আরও অসুস্থ হয়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। সবকিছু চিন্তা করে হাইক্যাম্পে ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করলাম। আপুকে জানালে আপু সম্মতি দিলে একজন গাইড হাইক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে যায়। এমন অভিজ্ঞতা এবারই প্রথম। ফিরে আসার সময় খুব মানসিক কষ্ট হচ্ছিল। মনকে বোঝালাম পাহাড় পাহাড়ের যায়গায়ই থাকবে সুস্থ থাকলে আবার আসতে পারবো। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলাম তাঁবুতে। ঘুম ভাঙ্গে আপুর ডাকে। আপু রেখা দু'জনেরই মন খারাপ সামিট হয়নি। প্রকৃতি, শারিরীক সুস্থতা সবকিছু পক্ষে থাকার পরও চূড়া থেকে মাত্র ২০০+ মিটার দূর থেকে কারইবা ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে। তবুও না থেমে গিয়ে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। পিসাং গ্রামে ফিরে এসে নতুন করে পরিকল্পনা হয় অন্য একটা ৬০০০+ উচ্চতার। শুরু হয় নতুন যাত্রা, ততদিনে উচ্চতাজনিত অসুস্থতাও কমে গিয়ে শরীর স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। বুনো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পথের পাশেই সকাল দুপুরের খাবার নিজেরাই তৈরি করেছি। হুমদে গ্রামে একটা সময় এয়ারপোর্ট ছিল। ঘরবাড়ি, এটিএম বুথ দেখে মনে হলো একসময় বেশ জৌলুস ছিল এই গ্রামের। এখন পরিত্যক্ত একটা ভুতুড়ে গ্রামের মতো দেখতে। ঘরবাড়ি আছে কিন্তু মানুষ নেই। পথ চলতে চলতে একটা বাড়ির জানালায় বাংলাদেশের পতাকা দেখে ভীষণ আনন্দ হয়। আমাদেরই অগ্রজেরা অভিযানের সময় লাগিয়ে দিয়েছিল। হুমডে থেকে নাওয়াল পৌঁছে যে দিদির লজে ছিলাম তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি। এরমধ্যে আমাদের নতুন গাইড পোর্টারের সাথে দেখা হয়। নাওয়াল থেকে আবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ছুটে চলি পর্বতের দিকে। ইয়াক খারকায় ছোট্ট একটা টি-হাউজে রাত্রিযাপন। এখানে একজন মাত্র মানুষের সাথে দেখা, যখন কেউ থাকে না নিঃসঙ্গ দিন-রাত কাটাতে হয়। বেসক্যাম্পে যেতে যেতে বড় একটা দলের সঙ্গে দেখা হয়। ডিসেম্বর ১৪ তারিখ রাতে চুলু ফার ইস্ট সামিটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সালের এই দিনেই আমরা হারিয়েছি আমাদের শ্রেষ্ঠ অগ্রজদের। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা স্মরণ করেই মাঝরাতে হিমশীতল বরফের মরুভূমিতে চলতে শুরু করি। পথ চলতে চলতে একসময় মনে হয় আর বুঝি পারবো না, মনকে বোঝাই এবং আবার এগিয়ে যাই। একটা সময় রাতের আঁধার কেটে গিয়ে ভোরের আলো ছড়ানো শুরু হয়। স্থানীয় সময় সকাল ৭টার দিকে আমরা পৌঁছাই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। ১৫ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের একদিন আগে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের নারীরা পৌঁছায় ৬০৫৯ মিটার উচ্চতার কোনো পর্বতে। চুলু ফার ইস্ট পর্বতের চূড়ায় উড়তে থাকে বহু মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা।

ইয়াছমিন লিসা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

'সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ' দ্বিতীয় পর্যায় চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ

৩১ জানুয়ারি ২০২৬

মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সেরা দশ)

১. তিয়োথী মজুমদার হিয়া, পেনফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা ২. মোছা. রুবাইয়া মুসরাত রিমু, পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া স্মৃতি গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ, পায়রাবন্দ, রংপুর ৩. রুবাইয়া পারভেজ রুপন্তি, মনিজা রহমান গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ৪. পল্লব বেপারী, সরকারি স্বরূপকাঠী পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫. তানজিদা তামিমা তুনজা, পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া স্মৃতি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ ৬. সুরাইয়া সালাহউদ্দিন, মিঠাপুকুর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর, ৭. জিদান মাহমুদ, আকলম মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর ৮. মো. জাবির আহমেদ দেওয়ান, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ৯. আশফিকা রহমান নওশিন, দনিয়া পাঠাগার, ঢাকা ১০, ফারিয়া আফরোজা রিক্তা, আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুল, ঢাকা

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় (সেরা পাঁচ)

১. আর্নিকা শিরিন জেনি, এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ, ঢাকা ২. ইব্রাহিম তালুকদার, গুলশান মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা প্রযুক্তা রায় ৩. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৪ মৌনতা মুমু, বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, নাটোর ৫. মারদিয়া সুলতানা সাগরিকা, সরকারি ইস্পাহানী ডিগ্রি কলেজ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

একাত্তরের স্মৃতিতে শহিদ মো. শেখ সুকুর

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে গত ২২ অক্টোবর আয়োজন করা হয় স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচির। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেনীর ২৭ জন শিক্ষার্থী জল্লাদখানা পরিদর্শন করে। পরিদর্শন শেষে শহিদ পরিবারের স্মৃতিচারণ শুরু হয়। শহিদ মো. শেখ সুকুর-এর পুত্রবধূ আঁখি বেগম শিক্ষার্থীদের সামনে তাঁর শহিদ শ্বশুরের হত্যার ঘটনা স্মৃতিচারণ করেন যা তিনি শাশুড়ি সমিরুন্নেছার মুখে শুনেছিলেন। হৃদয়বিদারক সেই ঘটনা শুনে মুহূর্তেই সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়।

মো. শেখ সুকুর মিরপুরে 'ওসমান ব্রাদার্স ফার্নিচার' নামক দোকানে একজন গদি মিস্ত্রি হিসাবে কাজ করতেন। আর এই কাজে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ও সুনাম ছিল। স্ত্রী-পরিবার নিয়ে তিনি মিরপুর ১০নং সেকশনে বসবাস করতেন। একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর মিরপুর এলাকাজুড়ে এক চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল বিহারি ও বাঙালিদের মধ্যে। ২৫ মার্চের কিছুদিন পূর্বে বিহারিরা প্রকাশ্যে রামদা, ছুরি ও বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে তৈরি হচ্ছিল বাঙালিদেরকে হত্যা করার জন্য। মো. শেখ সুকুরকে বিহারি এবং পাকসেনারা পর পর দু'বার ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে তিনি দু'বারই বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছিল। এই ঘটনাগুলোর পর থেকেই মো. শেখ সুকুর চিন্তিত ছিলেন যে, যদি তাঁর কিছু হয়ে যায় তাহলে ছেলে-মেয়েগুলোর কী অবস্থা হবে! পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক দেখে মো. শেখ সুকুর স্ত্রী ও ছয়জন সন্তানকে নিয়ে এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। বেরোবার সময় সন্তানদের জন্য ভবিষ্যতের একমাত্র সম্বল বলতে বাড়ির দলিলটি সাথে করে নিয়ে যান। প্রথমে আশ্রয় নেন মিরপুর গোলচক্করে অবস্থিত তাঁর পরিচিত এক গোয়ালার বাড়িতে। যখন বিহারিরা সেখানেও তান্ডবলীলা চালাতে শুরু করে তখন মো. শেখ সুকুর পরিবার নিয়ে আশ্রয় নেন মিরপুর বাংলা স্কুলে। সেখানেও থাকতে না পেরে চলে যান লক্ষীবাজারে। এক অপরিচিতের বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় পান। কিন্তু সেখানে পরিবারের সাতজন সদস্যের খাবার যোগাড় করতে অনেক হিমশিম খেতে হয়েছে মো. শেখ সুকুরকে। সেই সময় বাড়ির দলিলটি তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ি গেন্ডারিয়ায় রাখার জন্য মনস্থ করেন। কারণ যুদ্ধের সময় সেটাই ছিল তাঁর মতে সুরক্ষিত জায়গা। লক্ষীবাজারে দিন তিনেক কোনরকমে কাটানোর পর স্ত্রী সমিরুন্নেছাকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। এপ্রিল মাসের প্রথম বা মাঝামাঝি সময়ে মো. শেখ সুকুর গেন্ডারিয়ায় বাড়ির দলিল রেখে ঐদিনই ফিরে আসবেন বলে স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নেন। গেন্ডারিয়ায় কলুটোলা কাঠের পুলের নিকটেই ছিল পাকহানাদার বাহিনীর ক্যাম্প। সেদিন যখন মো. শেখ সুকুর কলুটোলা পুলের ওপর দিয়ে নদী পার হচ্ছিলেন তখন দূর থেকে পাকসেনারা তাঁকে মুক্তিসেনা সন্দেহে গুলি করে। তাঁর দেহটি ছিটকে নদীতে পড়ে যায়। স্বামী ফিরে আসছেন না দেখে সমিরুন্নেছা পাগল হয়ে যান। এদিক-সেদিক খোঁজ করার তিনদিন পর তিনি বাপের বাড়ি গেন্ডারিয়াতে যান। কিন্তু সেখানে কেউ তাকে মো. শেখ সুকুরের শহিদ হবার খবরটি জানায় না। অবশেষে পরিচিত একজন তাকে কলুটোলা কাঠের পুলের কাছে খোঁজ নিতে বলেন। কিন্তু ঐ পুলের কাছে কারো যাবার সাহস ছিল না। কারণ পাকসেনারা সেখানে যাকেই দেখতো, তাঁকেই নির্মমভাবে হত্যা করতো। কিন্তু সবার কথা অগ্রাহ্য করে সমিরুন্নেছা সেখানে যান স্বামীর লাশের খোঁজে। সেখানে স্বামীর লাশ চিনতে পেরে ফুলে-ফেঁপে ওঠা লাশটিকে নদী থেকে টেনে কোনরকমে পাড়ে নিয়ে আসেন। অসহায় স্ত্রী সমিরুন্নেসা স্বামীর লাশটিকে দাফন করাতে পারেননি কারণ লাশের মাংসগুলো খুলে খুলে পড়ছিল। বাধ্য হয়ে নদীর পানিতেই স্বামীর লাশ ভাসিয়ে দেন স্ত্রী সমিরুন্নেছা। এই মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি সমিরুন্নেছা তাঁর পুত্রবধূ আঁখি বেগমকে শুনিয়েছিলেন। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সামনে সেই স্মৃতিচারণে ভেসে উঠে কতটা নির্মম মৃত্যু হয়েছিল শহিদ মো. শেখ সুকুরের। এভাবেই জল্লাদখানায় সাপ্তাহিক স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একাত্তরের শহিদের আত্মত্যাগের কথা জানিয়ে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

– প্রমিলা বিশ্বাস, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

স্বপ্ন দেখতে হবে আকাশচুম্বী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থাপক শিক্ষা ও কর্মসূচি সত্যজিৎ রায় মজুমদার। ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ত্রপা মজুমদার। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রওনক জাহানের বোন রওশন জাহান সম্পাদিত এবং আমেরিকার ফেমিনিস্ট প্রেস থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থের কপি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়। সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ উৎসবের সমাপনী আয়োজনের উদ্বোধনী পর্ব শেষে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সদস্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জাদুঘরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে এবং চিত্রাংকন ও বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকান্ডের মাধ্যমে 'সুলতানার স্বপ্ন' তুলে ধরে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও কলাকেন্দ্র আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনী 'পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন' পরিদর্শন করে। বিকেলে পিঠা উৎসবের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

– মির্জা মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

এ কে খন্দকার বীর উত্তম স্মরণানুষ্ঠান

২-এর পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন জেনারেল ওসমানীর যুদ্ধ ভাবনা ও কৌশল ছিল তুলনামূলক প্রচলিত পদ্ধতির।

যুদ্ধ পরবর্তী এ কে খন্দকারের কর্মময় জীবনের উল্লেখ করে তিনি বলেন এয়ার ভাইস মার্শাল অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববান, সাহসী এবং দৃঢ়চেতা ছিলেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহান যখন বিআইডিএস-এর দায়িত্বে ছিলেন তখন একে খন্দকার ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে চাইলে পরিকল্পনামন্ত্রী এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেন এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহান স্বপদে বহাল থাকেন।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পক্ষে এয়ার কমোডর হাসান মাহমুদ তার কর্ম জীবন সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের নামে ঢাকায় একটি বিমান ঘাঁটির নামকরণ হয়েছে এবং তার অবদান সবসময়েই স্মরণ করা হবে বলে জানান। পরিবারের পক্ষে তাঁর কন্যা মাতুনা খন্দকার মোস্তফা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আব্বা গভীরভাবে এই দেশকে ভালোবাসতেন, এই ভালোবাসা থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো এটাই সঠিক। আজীবনই দেশের শান্তির জন্য তিনি কাজ করেছেন।

Directing Stories : Memory...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারস্পরিক সম্পর্ক অন্বেষণ করা এবং সেসব উপাদানকে কীভাবে দৃশ্যায়নের মাধ্যমে শক্তিশালী গল্পে রূপ দেওয়া যায়, তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় করা ও তাদের মধ্যে সৃজনশীল ভাবনা সৃষ্টি করা।

কর্মশালার সূচনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক জাদুঘরকে স্মৃতির পরিসর হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং ইতিহাস কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি আরও বলেন, আর্কাইভ ও গল্প বলার প্রক্রিয়া আমাদের অতীত বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণার উৎস।

পরবর্তী পর্ব পরিচালনা করেন পুরস্কারপ্রাপ্ত আইরিশ চলচ্চিত্র নির্মাতা Bob Gallagher। এই সেশনে তিনি স্থানভিত্তিক গল্প, নীরবতা, স্মৃতি ও অদৃশ্য অভিজ্ঞতাকে চলচ্চিত্রে ধারণ করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি দেখান কীভাবে ল্যান্ডস্কেপ, ইতিহাস ও ব্যক্তিগত পরিচয় একজন পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে এবং গল্প বলার ভাষা নির্মাণে ভূমিকা রাখে।

তৃতীয় সেশনটি পরিচালনা করেন Raja Nundlall, যিনি একজন ডকুমেন্টারি সিনেমাটোগ্রাফার। এই পর্বে ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রে ভিজ্যুয়াল ভাষার গুরুত্ব, সত্য ও আবেগের ভারসাম্য, নৈতিকতা এবং নান্দনিকতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে দেখান কীভাবে ক্যামেরার ব্যবহার একটি গল্পের গভীরতা ও অর্থ তৈরি করতে পারে। মধ্যাহ্ন বিরতির পর বক্তব্য রাখেন আইরিশ শিল্পী Salvatore of Lucan. তিনি চলচ্চিত্রের বাইরের এক ভিন্ন শিল্পভাষার মাধ্যমে ঘর, বাস্তুচ্যুতি, আত্মপরিচয় ও অন্তর্ভুক্তির ধারণা তুলে ধরেন। তাঁর উপস্থাপনা অংশগ্রহণকারীদের ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং ও ব্যক্তিগত বয়ান নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। দিনের শেষভাগে একটি মুক্ত প্রশ্নোত্তর ও মতবিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা তাদের প্রশ্ন, ভাবনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অতিথি প্রশিক্ষকদের সঙ্গে শেয়ার করেন। এর পর প্রশিক্ষকেরা দিনব্যাপী আলোচনার সারসংক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ কাজের দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন।

সমাপনী পর্বে কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদেরকে সনদ প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে আশা প্রকাশ করা হয় যে এই কর্মশালার আলোচনা ও অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীদের ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্র, শিল্পকর্ম ও গবেষণায় প্রতিফলিত হবে।

এম. ফারহাতুল হক
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, চলচ্চিত্র কেন্দ্র

লাইফ অব টিপু : নির্মীয়মাণ এক রহস্যঘেরা প্রামাণ্যচিত্র

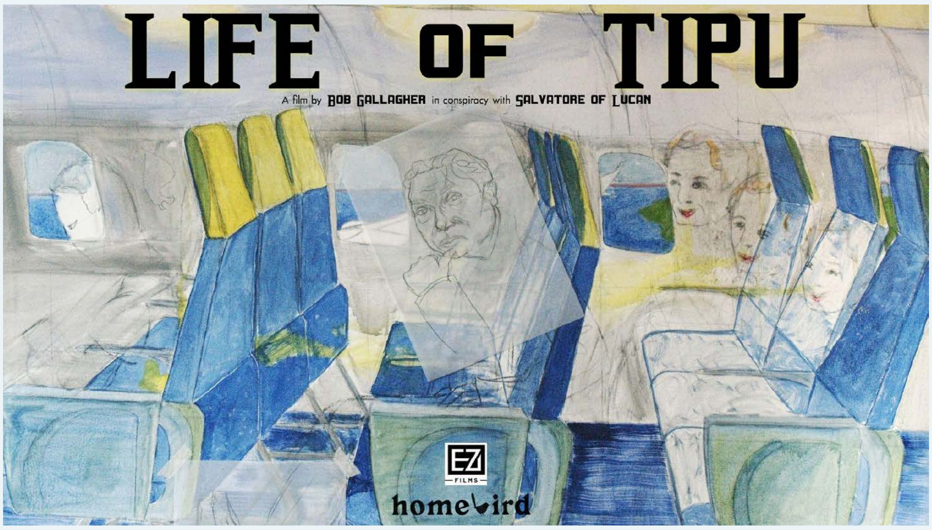

ডিসেম্বরের ১১ এবং ১২ এই দুটি দিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মুখরিত ছিল আইরিশ চলচ্চিত্রদলের নানা কর্মকান্ডে। দলে ছিলেন পরিচালক বব গ্যালাহার, ক্যামেরাম্যান রাজা নন্দলাল এবং প্রামাণ্যচিত্রের মুখ্য চরিত্র সালভাতোর মুলাম। মিউনিখ, ডাবলিন, নিউইয়র্ক এবং ঢাকা-বরিশালের লোকেশনে তাঁরা চিত্রধারণ করবেন এবং বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হয়েছিল এই কাজের সূচনাবিন্দু, এরপর তাঁরা গিয়েছিলেন বরিশাল ও স্বরূপকাঠিতে।
আইরিশ একক-মাতা বা সিঙ্গল মাদারের পুত্র প্রতিভাবান তরুণ চিত্রশিল্পী সালভাতোরের জীবনরেখা অনুসরণ করে নির্মিত হচ্ছে এই প্রামাণ্যচিত্র। সালভাতোরের পিতৃপরিচয় জানা ছিল না, মা যেমন এ-নিয়ে কখনো কথা বলেননি, তেমনি পিতা-পরিত্যক্ত পুত্রও খুব একটা জানতে চায়নি। বহুকাল পর, সালভাতোর যখন উদীয়মান শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন, সেই সময় ১৯৮৮ সালে নিউইয়র্ক থেকে এক নারী তাঁকে ফোন করে জানান, তিনি তাঁর পিতাকে চেনেন, পিতা হচ্ছেন বাংলাদেশের টিপু, বর্তমানে নিউইয়র্কবাসী, সালভাতোর যদি আগ্রহী হয় তবে পিতা-পুত্রের সাক্ষাতের ব্যবস্থা তিনি করে দিতে পারেন।

এর পরের অধ্যায় রহস্যকাহিনির মতো, মায়ের সঙ্গে আলাপ করে সালভাতোর নিউইয়র্কে আসেন, ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে পিতা ও পুত্রের সাক্ষাৎ ঘটে, কেউ কাউকে খুব বুঝতে পারেন না, টিপু কিছুটা ডিমেনশিয়ায় ভুগছে, সালভাতোর এটুকু জানতে পারে টিপু এসেছেন বরিশাল থেকে, একেবারে বাল্যে পিতাকে হারিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর বাবাকে পাকবাহিনী হত্যা করে। বাবার শবদেহ আর পাওয়া যায়নি।
এরপর সালভাতোর আয়ারল্যাণ্ডে দেশে ফিরে গেলেও বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ মন থেকে কখনো ঝেড়ে ফেলতে পারে না। চিত্রপরিচালক বব গ্যালাহারের সঙ্গে এই সময়েই পরিচয় এবং দানা বাধে সালভাতোর-টিপুর কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের বাসনা। এই সূত্রেই নির্মাণদলের ঢাকায় আসা, বাংলাদেশকে বোঝার চেষ্টায়। সেই তাগিদ থেকেই ফিল্মের দল এসেছে বাংলাদেশে, সালভাতোরের জীবনানুসন্ধান চলচ্চিত্রে ধারণের জন্য। ইতিমধ্যে মিউনিখে তাঁরা শুটিং করেছে, যেখানে এক গ্রীষ্মে প্রথম দেখা হয়েছিল সালভাতোরের মা এবং টিপুর। বাংলাদেশে শুটিং শেষে পরে কোনো সময়, যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে তাঁরা যাবেন নিউইয়র্কে, আবারও কথা হবে টিপু এবং সালভাতোরের। ধারণ করা হবে সেই চিত্র। এরপর সকল অভিজ্ঞতা মিলিয়ে সালভাতোর আঁকবেন পেইন্টিং সিরিজ, চলচ্চিত্রের উদ্বোধনীর সাথে সেই ছবিরও হবে প্রদর্শনী।
বর্তমান আয়ারল্যাণ্ড, আমেরিকা, বাংলাদেশ মিলে ইতিহাস ও ব্যক্তিজীবনের এক ব্যতিক্রমী আলেখ্য হবে এই প্রামাণ্যচিত্র। আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবীজ নিয়ে নির্মীয়মাণ এই চলচ্চিত্রের আমরা সাফল্য কামনা করি।

২১ জানুয়ারি ২০২৬ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত ইতিহাস নির্ভর 'রেইনকোট' উপন্যাস অবলম্বনে জাহিদুর রহিম অঞ্জন নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র 'মেঘমল্লার'-এর ডিপিএক্স মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আর্কাইভে প্রদান করছেন নির্মাতা-জায়া ও কথাসাহিত্যিক শাহীন আখতার।

গ্রন্থাগারে নতুন সংযুক্তি

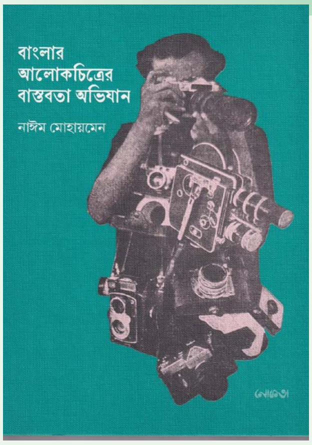

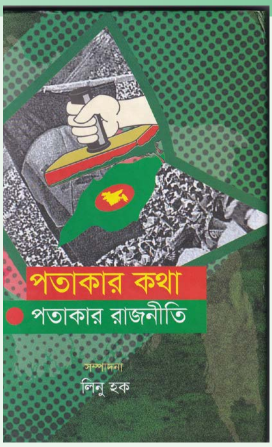

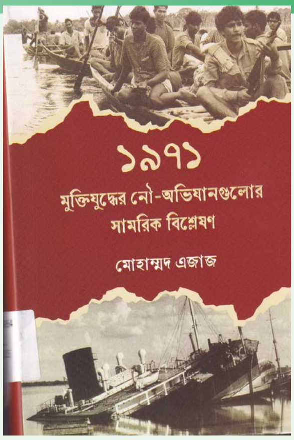

'১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের নৌ-অভিযানগুলোর সামরিক বিশ্লেষণ' বইটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ লিনু হক প্রদান করেন তার সম্পাদিত 'পতাকার কথা : পতাকার রাজনীতি' গ্রন্থটি, চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রবন্ধকার এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজ্যুয়াল আর্টস বিভাগের আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টাডিজের পরিচালক নাইম মোহাইমেন জাদুঘর গ্রন্থাগারের জন্য তার রচিত 'বাংলার আলোকচিত্রের বাস্তবতা অভিযান' গ্রন্থটি প্রদান করেন।

সিএসজিজে স্বেচ্ছাসেবী প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক সমাপনী

২৪ জানুয়ারি ২০২৬, শনিবার–একটি শান্ত, প্রায় নিরব দিন। শীতের কোমল রোদ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দেয়ালে পড়ে ইতিহাসের স্মৃতি আর বর্তমানের প্রশ্নকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলেছিল। ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই সেন্টার ফর স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (CSGJ)-এর ভলেন্টিয়ারি প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজন কেবল একটি প্রোগ্রামের শেষ ঘোষণা নয়; বরং এটি ছিল শিল্প, চিন্তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি দীর্ঘ যাত্রার স্বীকৃতি। 'সুলতানার স্বপ্ন' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ভলান্টিয়ারি সেশন যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছে, তা আজকের সমাজের জন্য ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

এই সেশনে অংশগ্রহণকারী দশজন ভলান্টিয়ার কাজ করেছেন দশজন সমসাময়িক শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে। প্রতিটি শিল্পকর্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা তুলে ধরেছেন লিঙ্গ, শরীর, আকাঙ্ক্ষা ও সমাজব্যবস্থার জটিল সম্পর্ক। রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' যেমন একসময় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিপরীতে এক কল্পনাশক্তিসম্পন্ন প্রতিবাদ ছিল, তেমনি এই শিল্পকর্মগুলোও বর্তমান সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা বৈষম্য ও নীরব দমনের গল্প প্রকাশ করে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় শিল্পী হেলাল সম্রাটের শিল্পকর্ম 'হয় তুমি শিকার বা শিকারী'। এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে ফুটে ওঠে, কীভাবে পুরুষ শরীরের জন্য যেসব বিষয় স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য, সেগুলো নারীর শরীরের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে কামনা, নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক বিচারবোধের বিষয়। ভলান্টিয়ারদের উপস্থাপনায় স্পষ্ট হয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কেবল নারীর স্বাধীনতাই খর্ব করে না, বরং পুরুষকেও আবদ্ধ করে একটি নির্দিষ্ট আচরণগত কাঠামোর মধ্যে। এই শিল্পকর্ম যেন সমাজের দিকে ছুঁড়ে দেয় এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন– স্বাভাবিকতা আসলে কার জন্য?

এরপর আলোচনা হয় শিল্পী আসাং মং-এর 'জগতের ভেতর জগৎ' নিয়ে। এই শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের ভেতরের ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষা, যেগুলো সামাজিক নিয়ম, ভয় ও প্রত্যাশার চাপে প্রকাশ পায় না। শিল্পকর্মটি যেন একটি নীরব মানসিক মানচিত্র, যেখানে লুকিয়ে থাকে অপূর্ণ ইচ্ছা ও অব্যক্ত স্বপ্ন। ভলান্টিয়ারদের বিশ্লেষণে এটি হয়ে ওঠে আত্মপরিচয় ও আত্মসংঘাতের প্রতীক, যা আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান।

আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শিল্পী রুপশ্রী হাংজয়ের 'সংগ্রাম' শিল্পকর্মটি। এখানে ফুল ও নারীর জীবনের মধ্যে একটি গভীর প্রতীকী সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন একটি ফুলকে ফুটে উঠতে হলে প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করতে হয়, তেমনি নারীকেও সমাজের নানা বাধা, নিপীড়ন ও অবহেলার ভেতর দিয়েই নিজের অবস্থান তৈরি করতে হয়। এই শিল্পকর্ম নারীর সংগ্রামকে কেবল কষ্টের গল্প হিসেবে নয় বরং টিকে থাকার সাহস ও শক্তির প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থাপন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পী, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিচর্চায় যুক্ত ব্যক্তিবর্গ। তাদের উপস্থিতিতে এই আয়োজন একটি আন্তঃপ্রজন্ম সংলাপের রূপ নেয়, যেখানে শিল্প হয়ে ওঠে প্রশ্ন করার ভাষা এবং ইতিহাস হয়ে ওঠে সমসাময়িক বাস্তবতা বোঝার হাতিয়ার। আলোচনা ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়, শিল্প কেবল নান্দনিক অভিজ্ঞতা নয়–এটি সামাজিক পরিবর্তনের একটি কার্যকর মাধ্যম।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ভলান্টিয়ারদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, যা তাদের কাজের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পাশাপাশি ভবিষ্যতের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তবে এই সমাপ্তি কেবল সময়সূচির; চিন্তা ও প্রশ্নের যাত্রা এখানেই শেষ নয়। CSGJ-এর এই ভলান্টিয়ারি প্রোগ্রামের সমাপনী অনুষ্ঠান প্রমাণ করেছে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মতো একটি ঐতিহাসিক স্থানে দাঁড়িয়েও বর্তমান সমাজের জটিল প্রশ্নগুলো নতুনভাবে ভাবা সম্ভব। 'সুলতানার স্বপ্ন' যেমন একদিন ভবিষ্যতের কল্পনাকে সাহস জুগিয়েছিল, তেমনি এই প্রোগ্রাম নতুন প্রজন্মকে শিখিয়েছে–স্বপ্ন দেখতে জানতে হয়, আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবের দিকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন চিন্তা, শিল্প এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই যাত্রা এখানেই শেষ নয়; বরং এখান থেকেই শুরু হয় আরও সচেতন ও মানবিক সমাজ গঠনের নতুন পথচলা।

ফারিয়া আক্তার
ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে
ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ

জাদুঘরের সংগ্রহশালা থেকে

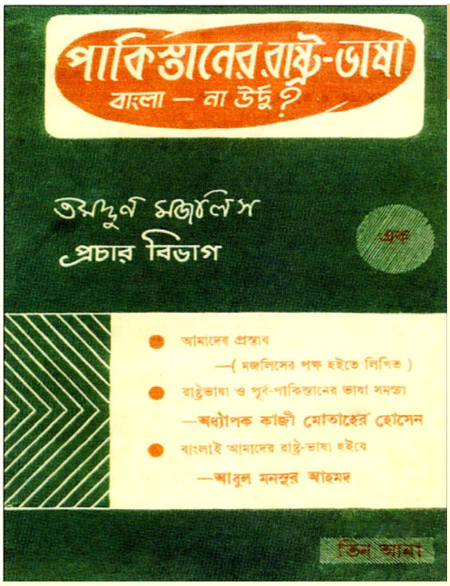

তমদ্দুন মজলিশ

নবগঠিত পাকিস্তানে ইসলামী আর্দশ ও ভাবধারার সঙ্গে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সম্মিলন ঘটাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তমদ্দুন মজলিশের অবস্থানে পূর্ববাংলার জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিলো। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলাভাষা বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিশের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১ অক্টোবর প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে তমদ্দুন মজলিশ কর্মী এবং অনান্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের যৌথসভায় শামসুল আলমকে আহবায়ক করে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' নামে একটি নতুন কমিটি গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের নেতা-কর্মীরা চরম নিগ্রহের শিকার হন। পুলিশ হামলা চালিয়ে মজলিশের কেন্দ্রীয় দফতর এবং সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার অফিস তছনছ করে। সংগ্রাম পরিষদের কাজী গোলাম মাহবুব গ্রেফতার হন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এক নম্বর গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে তমদ্দুন মজলিশের প্রচারপত্র ।

‘সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ’ দ্বিতীয় পর্যায়

পাঠাগারের সাথে আলাপচারিতা

দনিয়া পাঠাগার, দনিয়া, ঢাকা

হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, হাজারীবাগ, ঢাকা

গ্রন্থবিতান, লালমাটিয়া, ঢাকা

শিশু-কিশোর মেলা পাঠাগার, আগারগাঁও, ঢাকা

‘সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ’ দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎসব আয়োজনের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট পাঠাগার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং পাঠ-প্রতিক্রিয়া নিয়ে আয়োজন করে বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব অনুষ্ঠান। জানুয়ারি ২০২৬-এর ৫ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত ১২টি প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত অনুষ্ঠান এবং প্রস্তুতি পরিদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারী নিশাত মজুমদার, ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের অধ্যাপক ড. ফওজিয়া মান্নান এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা শামীম আখতার। কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপক ড. রেজিনা বেগম, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, শিক্ষাকর্মসূচি ব্যবস্থাপক সত্যজিৎ রায় মজুমদার এবং সাম্মানিক ব্যবস্থাপক এসএম মোহসীন হোসেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ অতিথি

৬ জানুয়ারি ২০২৬ আইরিশ চলচ্চিত্র পরিচালক Bob Gallagher এবং ফটোগ্রাফার Raja Nandlall মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

১২ জানুয়ারি ২০২৬ টেক্সটাইল আর্টিস্ট Clemence Vazard মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

১৩ জানুয়ারি ২০২৬ ইতালিয়ান পরিচালক Lydia Genchi মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

১৬ জানুয়ারি ২০২৬ ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি দল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ‘পুর্নকল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন’ শীর্ষক প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official